মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য ও ৭৩ ফিরকার হাদীস (পর্ব-১)

ইয়াসির ক্বাদী

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এবং শান্তি ও বরকত নাযিল হোক মানবতার মহান দূত রাসূল (সঃ) এর প্রতি।

আজকের আলোচ্য বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং কঠিনও বটে। বিষয়টি আমাদের আবেগ-অনুভূতিকে নাড়া দেয়। প্রত্যেকের এই বিষয়ে আবেগময় মতামত আছে। আমি এই ব্যাপারে আমার অবস্থান পরিষ্কার করতে চাই। তাই আমি উক্ত বিষয়ে আপনাদেরকে মুক্ত মনে শোনার জন্য অনুরোধ করব এবং ভিন্ন মত পোষণের অনুমতি চাইব। আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি ভেবে দেখতে।

আজকের আলোচনায় আমি বহুল আলোচিত হাদিসটিতে চলে যাব। হাদীসে বর্ণিত, “আমার উম্মাহ্‌ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে”। অবশ্য আমার বক্তব্যের পর ডঃ তারিক রমাদানেরও একটি বক্তব্য আছে। আমি উক্ত হাদীসটির উপর বিস্তারিত আলোচনা করব। হাদীসটি আমরা কিভাবে হৃদয়ঙ্গম করব তা আমি তুলে ধরব। এক্ষেত্রে উক্ত হাদীস নিয়ে আমাদের কর্মপদ্ধতি কী হবে, তা আলোচনা করে আমি ইতি টানব।

শুরুতে বলি, আমি একজন ধর্মতত্ত্ববিদ। আমার যোগ্যতা ও দক্ষতার ক্ষেত্র ইসলামিক ধর্মতত্ত্ব। মদিনা ইউনিভার্সিটি থেকে আমার মাস্টার্স এবং ইয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে আমার পিএইচডি ইসলামিক ধর্মতত্ত্বের বা আকীদার উপর করা।

উক্ত হাদীস আলোচনা করার পূর্বে একটি হতাশার কথা বলি। কিছু লোক বলে, “আকীদা নিয়ে কে মাথা ঘামায়? আপনার পুরো সাবজেক্টটি সময় অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। আপনার বিশ্বাস নিয়ে কে চিন্তা করে? আকীদা এমন একটা পাঠ্যবিষয় যেটা জনগণের মধ্যে বিভাজন ও তিক্ততা সৃষ্টি করে।” ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে উক্ত মন্তব্য একটু অপমানজনক বটে, কারণ আমার পুরো জীবনটা ইসলামিক ধর্মতত্ত্বের জন্য উৎসর্গকৃত।

আপনার গড়ে উঠার পরিবেশ যাইহোক, আপনার আকীদা যাইহোক এমন কিছু বিশ্বাস ও নীতি আছে যেগুলো আপনার বিশ্বাসের সীমা টপকে যায়। অতীতে মুসলিম জাতির ছোট একটা ফিরকা ছিল যারা বিশ্বাস করত, আল্লাহ পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সর্দারের কাছে অবস্থান করেন। আর হেঁটে বেড়ানো এই ‘ শেখটি’ ছিল আল্লাহ। এখন আপনারা বলেন আমাদের মধ্যে কে এই বিশ্বাসটি গ্রহণ করবে? অনুরূপভাবে, মুহাম্মাদ (সঃ) এর পরে এসে কেউ যদি নিজেকে নবী দাবি করে বা তার নিকট আরেকটি কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলে, তাহলে তার দাবিটি আমাদের বিশ্বাসের সীমারেখার বাইরে।

শুরুতে আমাকে একটু দার্শনিক ভঙ্গিমায় বলতে হয়, সংজ্ঞানুসারে প্রতিটি সংজ্ঞার একটি সীমারেখা থাকতে হয়। আপনি বলতে পারেন আমি একজন মুসলিম; তখন ঐ প্রাচীন, উদ্ভট ফিরকাটি বলবে, “তার অর্থ আপনি আমাদের ‘ শেখকে’ আল্লাহ বলে বিশ্বাস করেন, কেননা আমরাও মুসলিম”। আপনি তখন বলবেন, “না না না”। আমি আপনাদের ‘ শেখকে’ আল্লাহ বলে বিশ্বাস করি না। সারকথা হলো এই, নিজেকে মুসলিম বলতে হলে অবশ্য আপনাকে কিছু সীমারেখা টানতে হয়।

কুরআন অনেক কাজকে সমালোচনা করে। যেমনঃ তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ো না, মদপান করো

না। আকীদার অনেক বিষয়ও কুরআন সমালোচনা করে। যেমনঃ ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা হিসেবে বিশ্বাস করো না, প্রতিমাসমূহ কখনো তোমাদের কল্যাণ করতে পারে না। সমালোচনার পাশাপাশি কুরআন অন্য ধর্মতত্ত্ব প্রচার করে। যেমনঃ আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ এক। অতএব, আকীদার গভীরে প্রবেশ করলে আপনাকে বিশ্বাসের সীমারেখায় নির্দিষ্ট, সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ম হতে হয়। এটা মানুষের ধর্ম।

আমার আলোচনার মূল বিষয় ‘ ৭৩ দলে বিভাজনের’ হাদিসটি নিয়ে। এই হাদিসটি ১৫ জনের বেশি সাহাবা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আনাস ইবনে মালিক (রাঃ), জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), আবু হুরাইরা (রাঃ) সহ প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর উক্ত হাদিসটি বারোটিরও বেশি হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমনঃ সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযি, আল হাকিম, ইবনে হিব্বান, মুসনাদে ইমাম আহমদ সহ আরো অনেক গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

উক্ত হাদিসের কিছু মতনে শুধুমাত্র এই কথা বলা আছে, “আমার উম্মাহ ৭৩ ফিরকায় বিভাজিত হবে”। কতিপয় হাদিসে এতটুকু বলা আছে, “আমার উম্মাহ পূর্ববর্তী উম্মত ইহুদী খ্রিষ্টানের মত বিভিন্ন দলে বিখণ্ডিত হবে”। অপর বর্ণনায় এসেছে, “এদের মধ্যে একটি দল ছাড়া বাকি দলগুলো পথভ্রষ্ট”। মোটকথা হলো উক্ত হাদিস বিভিন্ন বাক্যে, শব্দগুচ্ছে এসেছে। সুন্নী ধারার ইসলামিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যথাঃ ফিকাহ, হাদিস, আকায়েদ, ইতিহাস ইত্যাদির আলেম ও চিন্তাবিদরা উক্ত হাদিসকে বিশুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইবনে হাজার, আন-নাওয়ায়ী, ইবনে কুদামা, আয-যাহাবী, ইবনে তাইমিয়া সহ আরো অনেক আলেমগণই এই হাদীসকে সহীহ হাদীস হিসেবে গণ্য করতেন।

তবে দু-তিনজন আলেম একে জাল হাদীস হিসেবে মত দিয়েছেন। লেকচারের স্বার্থে আমি প্রধান অভিমতটি নিয়ে ব্যাখ্যা করব। আমি ব্যক্তিগতভাবে উক্ত হাদিসটি সহীহ হিসেবে মানি, কেননা এটা অনেক সাহাবায়ে কেরাম দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। তবে যুগে যুগে উক্ত হাদিসটির ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে এবং ভুলভাবে অনুধাবন করা হয়েছে। আমাদের পূর্ববর্তী শায়েখ, ফকীহ, মুহাদ্দিস এবং ওলামারা উক্ত হাদিসের অনেক বিতর্কিত, সমালোচিত ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। তারা উক্ত হাদিসকে কুরআন ও সুন্নাহর কষ্টি পাথরে ঝালাই করেছেন। আমি উক্ত হাদিসের পাঁচটি বড় ধরণের ভুল অনুধাবন ও অপব্যাখ্যা তুলে ধরব এবং পাশাপাশি আমার মতও তুলে ধরব।

প্রথমত, কতিপয় অপরিপক্ক লোক উক্ত হাদিসকে আক্ষরিক অর্থে ৭৩ ফিরকা হিসেবে বুঝেছেন। পরিষ্কারভাবে বলা যায়, এটা কখনো সঠিক মত নয়। অতীতের ইসলামি চিন্তাবিদরা হিসেব করে দেখেছেন, এই দলটি এক, এরপরে দুই, তারপরে তিন ... ইত্যাদি। যখনি উনি হিসেব শেষ করে ৭৩ এ উপনিত হয়েছেন, তখনি আরেকটি দলের আবির্ভাব ঘটে দলের সংখ্যা ৭৪ বা ৭৫ এ দাঁড়িয়েছে। অতএব আক্ষরিক অর্থে ৭৩ দল গ্রহণ করা কখনো শুদ্ধ নয়। আসল কথা হলো অনেক আলেমের মতে আরবীতে ৭, ৭০ কিংবা ৭০০ অধিক অর্থে বুঝানো হয়। যেমনটি কুরআনে এসেছে, “যদি আপনি তাদের মুনাফিকদের জন্য ৭০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করেন তথাপি আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না”। তার মানে কি এই, রাসূল (সঃ) ৭১ বার বা ৭২ বার ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হতো? সারকথা হলো ৭৩ দল বলতে প্রায় ৭০ তথা অধিক ফিরকা সৃষ্টির বিষয়টি বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, জ্ঞানীরা নয় বরং কতিপয় অল্প জ্ঞানের মুসলিমরা বলে, “৭৩ দলের মধ্যে এক দল হলো মুসলিম, আর বাকি ৭২ ফিরকা কাফিরদের অন্তর্গত”। এটা কখনোই সত্য নয়। রাসূল (সঃ) সরাসরি বলেছেন, “আমার উম্মাহ্”। বিভাজনটি ইসলাম ও কুফর এর মধ্যে নয় বরং ইসলামের অভ্যন্তরে। লক্ষ্যণীয়, উপদল ও ফিরকাগুলো হাদিসে বর্ণিত ‘আমার উম্মাহ’ এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ প্রত্যেক দলই রাসূলের উম্মাহ হওয়ার আশীর্বাদপ্রাপ্ত। তবে যারা মুহাম্মাদ (সা) এর পর নবুয়াত দাবী করে কিংবা যারা বলে আল্লাহ পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন “মানুষ” হিসেবে তারা এই ৭৩ ফিরকার তালিকার অন্তর্ভূক্ত নয়। এখান থেকে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ উসূল বের করা যায়। হাদিসে এক মুসলিমের উপরে অন্য মুসলিমের হকের কথা আলোচিত হয়েছে। তার মানে অন্য ফিরকার মানুষটিও সালাম পাওয়ার ও ফিরিয়ে দেওয়ার যোগ্য, অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া, মৃত্যুর পরে কবর জিয়ারত করা অপর মুসলিমের কর্তব্য। প্রত্যেক মুমিন ভাই ভাই। উপসংহার হলো এই বিভাজনটা ইসলামের অভ্যন্তরে, বাইরে নয়।

তৃতীয়ত, হাদীসের এক রেওয়ায়েতে রাসূল (সঃ) বলেছেন, “৭৩ ফিরকার মধ্যে ৭২ ফিরকাই পথভ্রষ্ট হবে, আর শুধুমাত্র একটি দল সঠিক পথে থাকবে”। এই হাদিসটি আরো বড় ধরণের ভুল ব্যাখ্যার দিকে ধাবিত করে। ৭৩ দলের মধ্যে ৭২ দল, অর্থাৎ একটা বিশাল ভগ্নাংশ জাহান্নামে যাবে। সংক্ষেপে বললে, পুরো উম্মাতের অতি সামান্য অংশ জান্নাতে যাবে। অথচ কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন আয়াত ও মতন উক্ত ব্যাখ্যার বিরোধিতা করে। যেমনটি হাদীসে এসেছে, “ইন্না উম্মাতি উম্মাতি মারহুমাহ - নিশ্চয় আমার উম্মাহ রহমতপ্রাপ্ত, আশীর্বাদপুষ্ট”। রাসূল (সঃ) আরো বলেছেন, “জান্নাতের এক বিশাল অংশ হবে আমার উম্মত থেকে।

আমার উম্মাহ এত বিশাল হবে যে, কোন নবীর উম্মাহ সংখ্যায় এর ধারে কাছেও থাকবে না"। রাসূল (সা) এর শাফায়াত গোটা মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য।

তাহলে হাদীসটি আমরা কিভাবে অনুধাবন করব? ব্যাপারটা খুবই সহজ। উম্মাহর এক ক্ষুদ্র অংশ জাহান্নামে যাবে। এক্ষেত্রে আমি আপনাদের 'জাহমিয়্যাহ' নামক গত হওয়া এক ছোট্ট, উদ্ভট, আজগুবী দলের কথা বলব। আকীদার ছাত্র মাত্রই এই দল সম্পর্কে অবগত। এরা ছিল অত্যন্ত সক্রিয় একটি দল। মদীনা ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্সে আমার ৮৫০ পৃষ্ঠার আরবীতে থিসিস ছিল এই ছোট্ট ফিরকা এবং এর প্রতিষ্ঠাতাকে কেন্দ্র করে। এই ফিরকা এখন আর নেই। কিন্তু প্রত্যেক আকীদার বইতেই এই দলটির উপর আলোচনা রয়েছে। আমি এই বিষয়ের উপর মাস্টার্স করেছি। এবং এই জাহমিয়্যাহ দলের মোট অনুসারীর সংখ্যা ছিল ৫০ এবং অন্য বর্ণনায় সর্বোচ্চ ১০০ জন। অথচ জ্ঞানের জগতে এদের ব্যাপারে সরব আলোচনা দেখে অনেকে মনে করতে পারে এরা সংখ্যায় অনেক বড়। এমনকি বুখারী খণ্ডের শেষ অধ্যায়টির নাম দেওয়া হয়েছে 'কিতাবুত তাওহীদ ওয়ার রদ্দ আলাল জাহমিয়্যাহ'। ইমাম বুখারি জাহমিয়্যাহদের যুক্তি খণ্ডানোর বিষয়টি উক্ত অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। আসলে ঐ পথভ্রষ্ট দলে অনুসারীর সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। অতএব সরব আলোচনা সংখ্যাধিক্য নির্দেশ করে না। আর মুসলিম উম্মাহ্‌ ঐতিহাসিকভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিল।

সাধারণ মুসলমানেরা ঈমানের ৬টি মূল বিষয়ে বিশ্বাস করে, ইসলামের ৫টি স্তম্ভে বিশ্বাস করে। এটাই প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এবং জটিল, দুর্বোধ্য আকীদা সাধারণ মুসলমানের অধ্যয়ন করা জরুরীও নয়। সুতরাং উম্মাহ্‌র অধিকাংশ মুসলমানই আল্লাহর রহমতপুষ্ট হবে। যেমনটি রাসূল (সা) বলেছেন, "ইন্না উম্মাতি উম্মাতি মারহুমাহ - নিশ্চয় আমার উম্মাহ রহমতপ্রাপ্ত, আশীর্বাদপুষ্ট"।

চতুর্থত, উক্ত হাদিসের একটি অংশের ভয়াবহ ইখতেলাফী ব্যাখ্যা উম্মাহর মধ্যে বিরাজমান। ঐ হাদিসের এক অংশে বর্ণিত, "উক্ত দলগুলোর প্রতিটিই জাহান্নামে যাবে, শুধুমাত্র একটি দল জান্নাতে যাবে"। ইমাম আশ-শাওকানি হাদিসটির এই অংশটিকে বানোয়াট বলেছেন, আর ৭৩ দলের হাদিসটিকে বিশুদ্ধ হিসেবে মত দিয়েছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিস ও বিশেষজ্ঞরা উক্ত অংশকেও বিশুদ্ধ বলেছেন। যদি উক্ত অংশ বিশুদ্ধও হয়, এরপরও কোন সমস্যা থাকার কথা নয়। কিভাবে???

কারণ আমাদের আকীদা বা বিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহ যা কিছু পুরষ্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন, তা বাস্তবায়ন করা নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন। আর আল্লাহ যেসব শাস্তির কথা বর্ণনা করেছেন তা বাস্তবায়ন করা আল্লাহর উপর আবশ্যক নয়। আমরা জানি, মহান রবের দয়া তাঁর হুঁশিয়ারি ও শাস্তির ভয়াবহতাকে অতিক্রম করে। দয়াময় আল্লাহ যদি কোন শাস্তির কথা বলেও ক্ষমা করে দেন, তা আল্লাহর পূর্ণাঙ্গতা। ধরুণ, পিতা তার সন্তানকে বলল, "যদি তুমি এটা কর, আমি তোমাকে এই শাস্তি দেব"। ছেলে করে ফেলল এবং সুন্দর একটা ওযর দেখিয়ে পিতার কাছ থেকে ক্ষমা পেয়ে গেল। পিতা শাস্তির কথা বললে ও শাস্তি বাস্তবায়ন করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য নয়। এক্ষেত্রে পিতার শাস্তি না দেওয়াটা তার দুর্বলতা নয়। প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো বিবেচনার যোগ্য। কেউ মদ্যপান করলেই আল্লাহ শাস্তি দিবেন ব্যাপারটি এমন নয়, তিনি ক্ষমাও করে দিতে পারেন। সেজন্য আলেমদের মত আল্লাহ তাআলা বাকি ৭২ দলের প্রত্যেক ব্যক্তির ভাল কাজ ও খারাপ কাজ আলাদাভাবে হিসেব করবেন এবং সে অনুসারে পুরষ্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

উক্ত হাদিসের ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়া কী বলেছেন জানেন? যারা ইবনে তাইমিয়াকে চিনেন তারা জানেন তিনি তার সিদ্ধান্তে খুবই কড়া এবং সোজাসাপটা ছিলেন। আপনি জানেন তিনি কি বলেছেন তাঁর মাজমু-আল-ফাতওয়া গ্রন্থে? তিনি বলেছেন, "কেবল সঠিক দলে থাকার কারণে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না কিংবা জান্নাতে সর্বোচ্চ আসন পাবে না। হতে পারে কোন ব্যক্তি ভুল ফিরকায় থাকার পরও ভাল কাজ এবং ইখলাসের কারণে জান্নাতে অধিকতর উচ্চ আসনে দাখিল হতে পারে আবার কেউ সঠিক দলে থেকেও গুনাহ এর কাজে লিপ্ত থাকলে বা অন্তরে অহংকারবোধ থাকলে সে জাহান্নামে যেতে পারে বা জান্নাতে নিম্নতর আসনে দাখিল হতে পারে।" এটি খুবই মৌলিক একটি নীতি যা আমাদের বুঝা উচিত এবং প্রয়োগ করা উচিত। সংক্ষেপে বলতে গেলে, একটি বাক্যাংশ সমস্যাপূর্ণ বলে উম্মতের অধিকাংশ আল্লাহর অনুগ্রহ, রহমত থেকে বঞ্চিত হবে এটা বলা যায় না।

পঞ্চমত, ধর্মতত্ত্বে মতামতের ভিন্নতার কারণে বিবিধ ফিরকা গড়ে উঠতে পারে না। ইখতেলাফ মানে ভিন্ন দল তা হতে পারে না। সাধারণভাবে বলতে গেলে, ঐতিহাসিকভাবে মুসলিম উম্মাহ এক সুন্দর বৈচিত্রতার ঐতিহ্য লালন করেছে। ফিরকা-দলাদলির উপদ্রব বাড়িয়েছে কেবলমাত্র আকীদা, আমলের বড় বিষয়গুলো। উদাহরণস্বরুপ, তাক্‌দির নিয়ে উদ্ভব ঘটেছে দুটো ফিরকার। একদল তাক্‌দিরকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, আর অন্য দল তা করে না। মুসলিমরা ছোট ছোট বিষয়গুলোকে পরিণত করেছে আকীদা ও ধর্মতত্ত্বের বড় আলোচনায়। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়, নামায কিভাবে পড়বেন, আমিন জোরে পড়বেন না আস্তে পড়বেন, তারাবিহ ৮ রাকাত না ২০ রাকাত, চাঁদ দেখা নিয়ে দ্বন্দ্ব ইত্যাদি। এক মহা মুশকিল। চাঁদ দেখা নিয়ে আলাদা সম্প্রদায়

গড়ে উঠতে পারে না। দেখতে হবে কোন মত পার্থক্যগুলো বড় আর কোনগুলো ছোট বা অতি নগণ্য। তাহলে উপসংহার কি?

প্রথমত, মুসলিম উম্মাহর বিশাল অংশ আকায়েদ ও ফিক্‌হী ইখতেলাফের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো নিয়ে মাথা ঘামায় না। সাধারণ মুসলিমদের আকীদার সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করার দরকার ও নেই। গড়পড়তা মুসলিম যদি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ মানে, নামায পড়ার চেষ্টা করে, পাপ থেকে বিরত থাকার তদবির চালায়; তাহলে সে ভাল মুসলিম। অপরপক্ষে, যারা ইসলামিক ডিসিপ্লিন নিয়ে পড়াশুনা করেন, যারা মাদ্‌রাসায় পড়ালেখা করেন, যাদেরকে মসজিদে ভূমিকা রাখতে হয়; তাদেরকে অবশ্য যে কোন বিষয়ে একটা তাত্ত্বিক অবস্থান নিতে হয়। ওলামারা নয় বরং তাদের অনুসারীরা ফিরকাগত সহিংসতায় সবচে বেশি জড়ায়। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়, এক দল বিশ্বাস করে সাহাবারা মুহাম্মদ (সা) এর পরে মুসলিম উম্মাহর সবচে ভাল মানুষ এবং উক্ত বিশ্বাস তাদের ধর্মের অংশ। অপরদিকে অন্য দল আছে যারা বলে, “সাহাবীদের মধ্যেও অনেকে ছিল যারা রাসূল (সা) কে মানত না এবং সাহাবীদের অনেকে রাসূলের অবাধ্য হয়েছিল”। তাহলে এ ব্যাপারে কি করা যায়?

দ্বিতীয়ত, আমরা আমাদের ভেতর অনেক বড় সমস্যা উপেক্ষা করতে পারি না। ইসনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই তাদের সাহসের জন্য, এই ধরণের বিষয়ের খোলামেলা আলোচনার সুযোগ তৈরির জন্য। সংলাপে সমাধানের সম্ভাবনা লুকায়িত। কুরআন ও সুন্নাহ অন্য ফিরকার উপর নিজের আকীদা চাপানোর জন্য কখনো শারীরিকভাবে আঘাতের অনুমোদন দেয় নি। খুব পরিস্কারভাবেই বলি, আমি সুন্নি। আমার স্পেশালাইজেশন আকীদার উপর। আমি সুন্নি মতাদর্শ মানি, প্রচার করি ও শিক্ষা দিই। আমি শিয়াদের আকীদার সাথে ভিন্ন মত পোষণ করি। তাই বলে আমি কখনো শিয়াদের উপর হামলা করা, তাদের মসজিদ জ্বালিয়ে দেওয়া বা বোমা হামলার অনুমতি দিতে পারি না। আমি যতই আমার আকীদার ব্যাপারে উৎসাহী হই না কেন আমি কারো উপর এই আকীদা জোর করে চাপানোর অনুমোদন দিতে পারি না, বোমা হামলা সমর্থন করতে পারি না। যারা বোমার সাহায্যে, তলোয়ারের সাহায্যে অন্যের উপর নিজের আকীদা চাপাতে চায় তাদের বিরুদ্ধে আমাকে সোচ্চার হতে হবে। আপনি যা বিশ্বাস করতে চান তা বিশ্বাস করুন। যখন যুক্তি-তর্কে করতে চান তাও করুন কিন্তু অন্য জন যা বিশ্বাস করতে চাই, তা তাকে বিশ্বাস করার স্বাধীনতা দিন।

তৃতীয়ত, সমাজের দা’য়ী, শাইখ, আয়াতুল্লাহ ও ওলামাদের অত্যন্ত সতর্কভাবে তাদের বক্তব্য পেশ করতে হবে। প্রত্যেক বিতর্কিত বিষয় আলোচনার একটা সময়, শ্রোতা, ভাষা ও পদ্ধতি আছে। যদিও ওলামারা সহিংসতা প্রচার না করে, তথাপি তাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতা তাদের অনুসারীদেরকে শারীরিক হামলা চালাতে উস্কে দিতে পারে। ইসলামি চিন্তাবিদ ও ওলামাদের উচিত হিকমাহর সাথে তাদের আদর্শ প্রচার করা। ভাই ও বোনেরা, অতীত জীবনের ভুল থেকে আমিও প্রচুর শিখেছি। দুই দশক আগে আমি নিজেও বিদ্রোহাত্মক বক্তৃতার স্ফুলিঙ্গ ছড়াতাম। আমি যা বলেছি তার জন্য আমি আজও অনুতপ্ত। এসব ছিল তরুণ বয়সের কথা। আমি অজুহাত দিতে পারি এসব আমার ২০-২২ বছর বয়সের কথা কিন্তু তা আমার ভুল শুধরাবে না। ইস! আমি যদি আমার কথাগুলো ফিরিয়ে নিতে পারতাম!! দা’য়ী ইলাল্লাহ এবং ওলামাদের আদর্শ প্রচারে স্বাধীনতা থাকলেও ঘৃণা, বিদ্বেষ, সহিংসতা ও রেষারেষি ছড়ানোর অনুমতি ইসলামে নেয়।

চতুর্থত, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যারা আকীদা নিয়ে উৎসাহী আমার মত তাদের মনে রাখা উচিত ইসলাম সবসময় মহৎ কোন উদ্দেশ্যে একে অপরকে সহযোগিতার তাগিদ দিয়েছে সে যেই দল, মত বা ধর্মেরই হোক। কোরআনের ভাষায়, “তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনে মদদ দিয়ো না”। আপনার আকীদা ও সামাজিক পরিবেশ যাই হোক, বড় লক্ষ্যে একে অপরকে সহযোগিতা করা যায়। কিছু বিষয়ে আমাদের একে অপরকে সহযোগিতা করা উচিত। সহযোগিতার স্বার্থে সমজাতীয় হওয়া অত্যাবশ্যক নয়। একটু পিছনে ফিরে যায়, আমার পিতা ১৯৬৩ সালে টেক্সাসে আসেন। তিনি বলেন- অতীতে ১৯৬০ ও ৭০ এর দশকে আমেরিকার মুসলমানদের মধ্যে নিজেকে সুন্নি, শিয়া, বেরলভী, আহলে হাদিস পরিচয় দেওয়ার মত বিলাসিতা ছিল না। সকল আমেরিকান মুসলিম মিলে তখন তারা মসজিদ নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন। তখনকার অল্পকয়েক মুসলিমরা যদি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত, তাহলে আর মসজিদ নির্মাণ করা সম্ভব হতো না। এরপর ১৯৭০ সালে এবং ৮০ এর দশকের গোড়ায় আমেরিকায় মুসলিম অভিবাসির অনুপ্রবেশ বাড়তে লাগল এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভাজনও প্রকাশ পেতে শুরু করল। আলহামদুলিল্লাহ তখনও কোন সমস্যা হয় নি; মুসলিম ও শিয়া যে যার মত চলতে লাগল। কিন্তু সংকট তখনই তৈরি হয় যখন সরকার শরীয়া নিষিদ্ধ করতে চায় বা মুসলিমদের উপরে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত নেয়; তখন সকল মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য থাকা চাই, সম্মিলিত অবস্থানে সবার একটি কণ্ঠস্বর থাকা চাই। সময় ও স্থান বুঝে সকলকে হাতে হাত মিলানো প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন মসজিদ হলেও কোন সমস্যা নেই। ব্যবধানগুলো ভুলে এক হওয়া মানে এই নয় যে, মতের পার্থক্যগুলোকে ছোট করে দেখা হচ্ছে। বরং এর দ্বারা আমরা ছোট বিষয়ের উর্ধ্বে উঠে বড় বিষয় দেখবো।

শিয়া-সুন্নি সকলের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত সাহাবী হযরত আলী (রঃ) এর একটি উদাহরণ টেনে আমার বক্তব্য শেষ করব। আলী

(রাঃ) এর খেলাফতের আমলে একদল তাঁর আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেল। ইতিহাস তাদেরকে খারেজি হিসেবে চিহ্নিত করে। আলী (রাঃ) খারেজিদের সাথে যে আচরণ করেছিলেন, তা আমরা সকলে ধারণ করতে পারি। তিনি খারেজিদের কাছে ধর্মতত্ত্ববিদ ও জ্ঞানী ব্যক্তি ইবনে আব্বাসকে পাঠালেন, যাতে তাদের সাথে প্রকাশ্য বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে পারে। ঐ বিতর্কে ইবনে আব্বাস তাদেরকে বুঝালেন এবং তৎক্ষণাৎ ওখানে খারেজিদের এক তৃতীয়াংশ মুসলিমদের দলে ফিরে আসল। বাকি দুই তৃতীয়াংশের কাছে আলী আবারো আরেকজন দূত পাঠালেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন- আপনারা যে আকীদা বিশ্বাস করেন, তা আমরা করি না। আপনাদের উপরে আমাদের বিশ্বাস চাপানোর কোন অধিকার নেই। তবে আপনারা আমাদের উপর যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ধরণের হামলা চালাবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত আমরাও কোন ধরণের হামলা চালাবো না। আলী (রাঃ) এর এই দর্শন আমাদের ভেতরে ধারণ, পালন ও লালন করতে হবে।

ভাই ও বোনেরা, মতানৈক্যের এই ধারা হাজার বছর ধরে চলে আসছে। মুসলিম উম্মাহর ভেতরকার এই ফিরকা ও দলাদলি কখনো সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যাবে না। এখন কথা হলো, আমরা নিজেদের মধ্যে ঘৃণা ছড়াছড়ি করলে কী এই বিভাজন বিলীন হয়ে যাবে? একটু বাস্তবতা বুঝার চেষ্টা করুন। তার চেয়ে বরং আমরা নিজেদের কাজ নিজেরা করে যাই এবং পৃথিবীটাকে একটু ভাল অবস্থায় রেখে যায়। আল্লাহকে আমাদের কাজের বিচারক বানাই। এই দুনিয়ায় আমরা কিছু বিষয়ে একমত হতে পারি যেমনঃ আমরা একে অপরকে হত্যা করবো না বা শারীরিকভাবে আঘাত করবো না ইত্যাদি।

ভাই ও বোনেরা, অবশেষে বলতে চাই দলাদলি ও সাম্প্রদায়িকতার সবচেয়ে বড় ক্ষতির দিক অহমিকা বা আত্মম্ভরিতা। আল্লাহর চোখে অহংকার অত্যন্ত ভয়াবহ অপরাধ। যে কেউ তার আকীদা ও ধর্মতত্ত্ব সঠিক মনে করতে পারে। তার মানে যেন এই না হয়, যে আমার মতের সাথে যে ভিন্ন মত পোষণ করবে, আমি তার চেয়ে উত্তম। হতে পারে আমার বিশ্বাস সহীহ, কিন্তু আমি ব্যক্তি হিসেবে ভাল না। আকীদা ও ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা জরুরী। সঠিক পথে থাকার এই আত্ম-নিশ্চয়তা আমাকে জাহান্নামে ঠেলে দিতে পারে। আকীদার বিষয়ে বিনয়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যদি আমি আর আপনি দুজনেই মনে করি নিজ নিজ অবস্থানে কেবল আমিই সঠিক তবে আমাদেরকে সেই কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে যা রাসূল (সঃ) এর জীবনে বাস্তবায়িত হয়েছে, এমন সত্য যা বিনয়ের দিকে ধাবিত করে, অহংকার দূর করে। আমাদের সেই নিয়মে ফিরে যেতে হবে যা রাসূল (সা) ও ঈসা (আ) আমাদের শিখিয়েছেন, প্রত্যেক নবী শিখিয়েছেন- অন্যদের সাথে ঠিক ঐ রূপ আচরণ করুন, যেমনটি আপনি নিজে তাদের কাছ থেকে আশা করেন। এটিই স্বর্ণসূত্র, সেই নিয়ম যা আল্লাহ এবং তাঁর দূত মুহাম্মদ (সা) আমাদের জন্য দিয়েছেন এবং যা রহমত ও সহমর্মিতার নিয়ম।

আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লহি ওয়া বারাকাতুহু।

ইয়াসির ক্বাদী

ইয়াসির ক্বাদী একজন পাকিস্তানী বংশোদ্ভুত আমেরিকান মুসলিম লেখক এবং পশ্চিমা বিশ্বে বহুল পরিচিত স্কলার ও এক্টিভিস্ট। তিনি ইসলামী এবং পশ্চিমা জ্ঞানকে সমন্বয় করার মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞানকে আধুনিক বিশ্বের সামনে তুলে ধরেন। তিনি পশ্চিমা বিশ্বে বহুল পরিচিত ইসলামিক শিক্ষামুলক প্রতিষ্ঠান আল-মাগরিব ইন্সটিটিউটের একাডেমিক অ্যাফেয়ার্স বিভাগের ডিন। পাশাপাশি তিনি আমেরিকার টেক্সাসে মেম্ফিস ইসলামিক সেন্টারের Resident Scholar এবং মেম্ফিস এর রোড্স কলেজের Religious Studies ডিপার্টমেন্টে প্রফেসর হিসেবে নিয়োজিত আছেন। তিনি জনপ্রিয় ওয়েবসাইট MuslimMatters.org এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।
ইসলাম ও সাম্প্রতিক বিষয়াদির উপর তাঁর প্রচুর লেকচার ইউটিউবে পাওয়া যায়। ২০১১ সালে নিউইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিনের একটি প্রতিবেদনে ইয়াসির ক্বাদীকে "আমেরিকার ইসলামে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব" হিসেবে উল্লেখ করা হয়।
শাইখ ইয়াসির ক্বাদী প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি শিক্ষা সমাপ্ত করেন সৌদি আরবে। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বিএসসি করেন আমেরিকার হিউস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে। এরপর চলেন যান মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সেখানে আরবিতে ডিপ্লোমা করেন এবং অনার্স করেন হাদীস ও ইসলামিক সাইন্সে। এরপর দাওয়াহ্ কলেজ থেকে ধর্মতত্ত্ব (ইসলামী আকিদা) বিষয়ে মাস্টার্স করেন এবং পুনরায় আমেরিকায় ফিরে যান। সেখানে আমেরিকার ইয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে Religious Studies বিভাগ থেকে পিএইচডি করেন।
তাঁর পিএইচডির বিষয় ছিলো ইমাম ইবনে তাইমিয়াহর (রাহিমাহুল্লাহ) আকল ও নাকল এর মাঝে সমন্বয়করণের উপর। ড. ইয়াসির ক্বাদীর থিসিসের শিরোনাম ছিলো "Reconciling Reason and Revelation in the Writings of Ibn Taymiyya."
তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মাঝে রয়েছে (১) Riya'a: The Hidden Shirk, (২) Du'aa: The Weapon of the Believer, এবং (৩) An Introduction to the Sciences of the Qur'an।